IslamHouse.com

সাওম বিষয়ক আধুনিক কিছু মাসআলা

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

ফিকহী গবেষণা সেন্টার, আল-ইমাম ইউনিভার্সিটি

অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবন কাওসার

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة

[قسم الصوم من العبادات]

مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

ترجمة: عبد العليم بن كوثر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

১২	অবশকারক/অনুভূতিনাশক ঔষধ/অবেদন পদ্ধতি (Anesthesia/এনেসথেসিয়া) সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা	
১৩	খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ ইনজেকশন সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা	
১৪	ঔষধি ইনজেকশন সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা	
১৫	সাওম পালনকারীর জন্য নিকোটিন গাম বা নিকোটিন প্যাচ (Nicotine Patch) ব্যবহারের বিধান	
১৬	সাওম পালনকারীর জন্য মালিশ, মলম ও প্লাস্টার ব্যবহারের বিধান	
১৭	ক্যাথেটার (Catheter) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?	
১৮	হেমো-ডায়ালাইসিস (Hemodialysis) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?	
১৯	পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritoneal Dialysis) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?	
২০	সাওম পালনকারীর জন্য সাপোজিটোরি (Suppository) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?	
২১	সাওম পালনকারীর জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিধান	
২২	সাওম পালনকারীর রক্ত পরীক্ষা করার বিধান	

আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ[১]

বিবরণ: সরাসরি খালি চোখ দিয়ে চাঁদ দেখাই হচ্ছে মূলনীতি। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এই মূলনীতির ওপরই আমল হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কোনো কিছুকে বড় করে দেখার জন্য টেলিস্কোপসহ আধুনিক অনেক যন্ত্রপাতিই আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে চাঁদ দেখা সম্ভব।

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চাঁদ দেখলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে?

পর্যালোচনা: শরী'আতের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা বা না দেখাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[1] মূল বইয়ের ৩৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

"তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই সাওম ছেড়ে দিবে"।[2]

তবে বর্তমান যুগের কোনো কোনো আলিম মনে করেন যে, সরাসরি চোখ দিয়ে চাঁদ দেখলেই কেবল তা শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়। তাদের মতে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক এসব যন্ত্রপাতির সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে, তবে সম্পূর্ণরূপে সেগুলোর ওপর নির্ভর করা যাবে না। সুতরাং খালি চোখে যদি চাঁদ দেখা না যায়, কিন্তু এসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দেখা যায়, তাহলে এই দর্শন গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের মতে, হাদীসে গ্রহণযোগ্য চাঁদ দেখার যে বিষয়টি এসেছে, তা শুধুমাত্র খালি চোখে দেখার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা এসব যন্ত্রপাতি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না।

---

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮০।

অবশ্য বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিমের মতে, যে কোনো উপায়েই হোক না কেন চাঁদ দেখাই হচ্ছে বড় কথা। সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদ ‘মাজলিসু হাইআতি কিবারিল ওলামাও এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। ১৬/৫/১৪০৩ হিজরী তারিখে পরিষদের সকল সদস্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে একমত হন:

১. চাঁদ দেখার কাজে সহযোগী হিসেবে মানমন্দির নির্মাণ করা যেতে পারে, এতে শর‘ঈ কোনো বাধা বা নিষেধ নেই।

২. খালি চোখে চাঁদ দেখা গেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও মানমন্দিরের মাধ্যমে তা দেখা না যায়।

৩. টেলিস্কোপের মাধ্যমে যদি সত্যি সত্যি চাঁদ দেখা সম্ভব হয়, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও খালি চোখে তা দেখা না যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“ফলে তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের সাওম পালন করবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَصُومُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوْا حتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا»

“(রমযানের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সাওম পালন করবে না। পক্ষান্তরে (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সাওম ছেড়ে দিবে না। মেঘ বা অন্য কোনো কারণে যদি চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে শা‘বান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে”।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন,

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ»

“তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে সাওম ছেড়ে দিবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে...”। উপরোক্ত হাদীসগুলোতে চাঁদ

দেখার শর্তারোপ করা হয়েছে মাত্র, সেগুলোতে খালি চোখ, টেলিস্কোপ বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেখা বা না দেখার কোনো শর্তারোপ করা হয় নি। তাছাড়া হাঁ-সূচক (المثبت) দলীল না-সূচক (النافي) দলীলের ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য।

৪. চাঁদ দেখার সম্ভাবনা থাক বা না থাক মানমন্দিরগুলোর বিশেষজ্ঞ দলের নিকট চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাব্য রাত্রিতে চাঁদ দেখার প্রয়াস চালানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫. সউদী আরবের চারটি বিভাগকে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ যন্ত্রপাতি সম্বলিত মানমন্দির গড়ে তোলা ভাল মনে করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক মানমন্দির নির্মাণের স্থান এবং খরচ নির্ধারণ করা হবে।

৬. চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাব্য স্থানগুলোতে চাঁদ দেখার প্রয়াস চালানোর জন্য ভ্রাম্যমান মানমন্দির গড়ে তোলা হবে। সাথে সাথে তীক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষদের থেকে চাঁদ দেখার কাজে সহযোগিতা নিতে হবে।

তবে কাযীর নিকটে চাঁদ দর্শনকারীর শরী‘আত নির্ধারিত ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হতে হবে।

চাঁদ প্রমাণের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করার বিধান[3]

বিবরণ: চাঁদ প্রমাণের জন্য চাঁদ দর্শনই ইসলামী শরী'আতে গ্রহণযোগ্য পন্থা; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করা যাবে কি? বিশেষ করে বর্তমান যুগের কোনো কোনো বিদ্যান বলে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ ٣٩﴾ [يس: ٣٩]

"চাঁদের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সেটি পুরাতন খেজুর শাখার আকার লাভ করে"। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৩৯]

অন্যত্র তিনি বলেন,

---

[3] মূল বইয়ের ৪০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

﴿ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٖ ۝٥﴾ [الرحمن: ٥]

“সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব মতো চলে”। [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৫] অর্থাৎ সূর্য এবং চন্দ্র সুনির্দিষ্ট হিসেব অনুযায়ী পরিচালিত, যে হিসাবের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। অনুরূপভাবে চার ঋতুর হিসেবেরও কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাছাড়া কোনো অভ্যাস যখন একই নিয়ম-নীতিতে চলতে থাকে, তখন তা নিশ্চয়তার ফায়দা দেয়।

তারা বলেন, বর্তমান যুগে জ্যোতির্বিদ্যা চরম উন্নতি সাধন করেছে এবং সূক্ষ্মভাবে তারকা, নক্ষত্র এবং ছায়াপথের হিসাব-নিকাশ রাখা সহজসাধ্য হয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্রের হিসাবতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণের নিকট খুব স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশকে চূড়ান্ত বলে দৃঢ়তা প্রকাশ করে থাকেন। এসব কিছুই উপরোক্ত বক্তব্যকে আরো শক্তিশালী করে। তাহলে শরী‘আত যেহেতু চাঁদ প্রমাণের জন্য চাঁদ দর্শনের নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানের এসব হিসাব-নিকাশ কি কোনো

আমলেই আনা যাবে না? নাকি শুধুমাত্র চাঁদ না দেখার পক্ষের প্রমাণ হিসাবে এগুলোর প্রতি নির্ভর করা যাবে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে নয়?

পর্যালোচনা: আগের এবং বর্তমান যুগের আলিমগণ এই মাসআলায় তিনটি মত প্রকাশ করেছেন:

প্রথম মত: হানাফী, শাফে‘ঈ, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ’র মতে, চাঁদ দেখা বা না দেখা কোনোটার প্রমাণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“ফলে তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের সাওম পালন করবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

উক্ত আয়াতে (الشهادة)-এর অর্থই হচ্ছে চাঁদ দর্শন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

"তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং (শাওয়ালের) চাঁদ দেখে সাওম ছেড়ে দিবে। মেঘ বা অন্য কোনো কারণে যদি চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে ৩০ দিন সাওম পালন করবে"।[4]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে সাওম ছেড়ে দিবে। যদি (মেঘ বা অনুরূপ কারণে) চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে (৩০ দিন) হিসাব কর"।[5]

---

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮১।

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮০।

এই পক্ষাবলম্বনকারীগণ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখার সাথে সাওম পালন এবং সাওম ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করেছেন। সাথে সাথে তিনি উম্মতকে এমর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ত্রিশতম রাতে যদি মেঘ বা অন্য কোনো কারণে চাঁদ দর্শন বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে তারা যেন ৩০দিন পূর্ণ করে নেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ প্রমাণের জন্য এতসব হিসাব-নিকাশের নির্দেশ উম্মতকে দেন নি; বরং কেবল চাঁদ দর্শনের মধ্যেই নতুন মাস শুরু হওয়া না হওয়ার বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। অতএব, শরী‘আতের দৃষ্টিতে চাঁদ দর্শন ব্যতীত অন্য কোনো উপায় চাঁদ প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিধানটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত শহুরে এবং বেদুঈন সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যদি সময় নির্ধারণের অন্য কোনো উপায় থাকত, তাহলে আল্লাহ তা তাঁর বান্দাদেরকে বলে দিতেন।

‘রাবেত্বাতুল আলাম আল-ইসলামী-এর প্রতিষ্ঠান ‘ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী’ এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে।

এমনকি যেসব এলাকার আকাশে বেশির ভাগ সময় মেঘ থাকে, সেসব এলাকাতেও এই বিধান প্রযোজ্য বলে মন্তব্য পেশ করেছে।

‘মুনাযযামাতুত-তা‘আউন আল-ইসলামী’-এর প্রতিষ্ঠান ‘আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমী’ বলেছে, চাঁদ দর্শনের ওপর নির্ভর করা অপরিহার্য, তবে হাদীস এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি খেয়াল রেখে এক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

সউদী আরবের ফাতওয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটি ‘আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল-ইফতা’-ও এই মত সমর্থন করেছেন।

দ্বিতীয়ত: জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য যে কোনো শাখা কতটা উন্নতি লাভ করেছে বা করবে, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ সম্যক অবগত। এতদসত্ত্বেও তিনি বলেছেন, ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ “ফলে তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের

সাওম পালন করবে” এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ “তোমরা চাঁদ দেখে সাওম রাখো এবং চাঁদ দেখে সাওম ছেড়ে দাও”। এখানে আল্লাহ চাঁদ দেখার সাথে সাওম পালন এবং সাওম ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করেছেন, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব-নিকাশের সাথে শর্তযুক্ত করেন নি, অথচ আল্লাহ জানতেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে এতো বেশি উন্নতি সাধন করবে। অতএব, চাঁদ দেখে সাওম পালন করা এবং চাঁদ দেখে সাওম ছেড়ে দেওয়ার ইলাহী এই বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া প্রত্যেকটি মুসলিমের ওপর অপরিহার্য। এই বিধানটি এক ধরণের ‘ইজমা’য় পরিণত হয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করবে, তার কথা ব্যতিক্রমী হিসাবে প্রমাণিত হবে এবং তার কথার ওপর নির্ভর করা যাবে না।

দ্বিতীয় মত: চাঁদ না দেখতে পাওয়া বা দেখতে পাওয়া উভয়ের প্রমাণ হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করা যাবে। এই অভিমতটি ইবন সুরাইজ, যা ইমাম শাফে‘ঈর একটি মত হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, মুত্বাররিফ ইবন আব্দুল্লাহ আশ-শিখখীর, ইবন কুতায়বা, ইবনস-সুবকী প্রমুখের বলে মনে করা হয়। অবশ্য ইবন আব্দিল বার এই অভিমতটি ইমাম শাফে‘ঈ এবং মুত্বাররিফ-এর নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবন হাজার রহ. বলেছেন, ইমাম শাফে‘ঈ এই মতের পক্ষে নন; বরং তিনি বেশির ভাগ বিদ্যানের মতের পক্ষে।

বর্তমান যুগের আলিম সমাজের মধ্যে শাইখ আহমাদ শাকের এবং শাইখ মোস্তফা যারক্বা রহ. মনে করেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করা যাবে।

তারা নিম্নোক্ত আয়াতটিকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন, ﴿ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٖ ۝٥﴾ [الرحمن: ٥]“সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব মতো চলে” [সূরা আর-রহমান,

আয়াত: ৫]। তারা বলেন, মহান আল্লাহ এসব গ্রহ-নক্ষত্র বিশেষ হিসাব-নিকাশ এবং প্রজ্ঞার সাথে সৃষ্টি করেছেন, এগুলো এলোপাতাড়িভাবে প্রবহমান নয়; বরং আল-কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী এসব গ্রহ-নক্ষত্র কীভাবে চলে, সে সম্পর্কে জানতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَ﴾ [الاسراء: ١٢]

"আর যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১২]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ۝٥﴾ [يونس : ٥]

"তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। আর এর (গতির) জন্য মনযীলসমূহ নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব

জানতে পার। আল্লাহ এ সমস্ত বস্তু যথার্থতার সাথে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই প্রমাণাদি বিশদভাবে বর্ণনা করেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।” [সূরা ইউনূস, আয়াত: ৫] নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়কে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ»

“তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে সাওম ছেড়ে দিবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে হিসাব কর”।[6] উক্ত হাদীসে হিসাব-নিকাশ করার এবং মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি খাটানোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮০।

«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ»

"আমরা নিরক্ষর জাতি। আমরা লিখি না এবং (গ্রহ-নক্ষত্রের) হিসাবও করি না। তবে মাস এরূপ এরূপ হয়ে থাকে অর্থাৎ কখনও ঊনত্রিশ দিনে আবার কখনও ত্রিশ দিনে"।[7]

উক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহ-নক্ষত্রের হিসাব-নিকাশ না জানার কারণে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করতে বলেছেন; কিন্তু এখন যেহেতু গ্রহ-নক্ষত্রের হিসাব-নিকাশ না জানার এই কারণটি নেই এবং মানুষের আজ চাঁদ দেখার মত বা তার চেয়ে বেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর আস্থা রাখা সম্ভব হয়েছে, সেহেতু মানুষ চন্দ্রমাসের শুরু প্রমাণের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে পারে।

---

[7] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮০।

এই মতাবলম্বীগণ আরো বলেন, চোখের দর্শন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশ চন্দ্রমাসের শুরু প্রমাণের দু'টি মাধ্যম মাত্র। এদু'টির একটি অন্যটির স্থলাভিষিক্ত। দু'টির যেকোন একটি বিদ্যমান থাকলে মাসের শুরু প্রমাণিত হবে। আর আমরা চাঁদ দর্শনকে ইবাদত মনে করি না; বরং চাঁদকে মাস শুরু হওয়ার মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র।

তারা মাসের শুরু প্রমাণের জন্য চাঁদ দর্শনকে সালাতের ওয়াক্ত প্রমাণের ওপর ক্বিয়াস করে বলেছেন, সারা পৃথিবীতে সালাতের ওয়াক্ত আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করে চলেছে। আমরা একজন আলিমকেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশকে বাদ দিয়ে শুধু সূর্য দেখে সালাতের ওয়াক্ত প্রবেশের হিসাব কষতে দেখি না। তাহলে হিজরী মাসের প্রারম্ভ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই হিসাব-নিকাশের বাস্তবায়ন কেন নিষিদ্ধ হবে!

তৃতীয় মত: চাঁদ না দেখতে পাওয়ার প্রমাণ হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করা যাবে;

চাঁদ দেখতে পাওয়ার প্রমাণ হিসাবে নয়। অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব-নিকাশ যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, (আজ) চাঁদ দেখা সম্ভব নয়, কেননা চাঁদ আজ সূর্যের আগে ডুবে যাবে, অতঃপর সূর্য ডুবার পরে কেউ সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব যদি প্রমাণ করে যে, আজ সূর্য ডুবার পরে চাঁদ দেখা সম্ভব, কিন্তু মেঘ, ধূলা, ধোঁয়া বা অন্য কোনো কারণে যদি দেখা না যায়, তাহলে এক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করা যাবে না; বরং ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে। বর্তমান যুগের কতিপয় আলিম এই মতকে সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ছালেহ আল-উসাইমীন রহ.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারা বলেন, ফকীহগণের নিকট অনুসৃত মূলনীতি হচ্ছে, কোনো সাক্ষ্য যতক্ষণ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বিষয় থেকে মুক্ত না হতে পারবে, ততক্ষণ সেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মূলনীতির আলোকে দেখা যাচ্ছে, সূর্যাস্তের পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানকারীর সাক্ষ্য তার

সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী বিষয় থেকে মুক্ত নয়। কেননা জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব নিশ্চিতভাবে বলছে যে, আজ চাঁদ সূর্যাস্তের পূর্বে অস্তমিত হয়ে গেছে।...

যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর ইফতার করল, অতঃপর বিমান উড্ডয়নের পর সূর্য দেখতে পেল[৮]

বিবরণ: কোনো মুসাফির ব্যক্তির এমন হতে পারে যে, তার সাওম পালন অবস্থায় বিমান উড্ডয়নের পূর্বে সূর্য অস্ত গেল। ফলে সে ইফতার করল, কিন্তু বিমান উড্ডয়নের পরে সে সূর্য দেখতে পেল। এমতাবস্থায় সে কি খানা-পিনা পরিহার করে চলবে নাকি খানা-পিনা চালিয়ে যাবে?

পর্যালোচনা: সূর্য ডুবার পর যে ব্যক্তি ইফতার করল, অতঃপর বিমান উড্ডয়নের পর সূর্য দেখতে পেল, সে খানা-পিনা চালিয়ে যেতে পারবে এবং তার সাওম বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে।

সঊদী আরবের ফাতওয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটি এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ. এই মত গ্রহণ করেছেন। শাইখ উসাইমীন রহ. তার মতামত

---

[৮] মূল বইয়ের ৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রকাশের পর নিম্নোক্ত হাদীসটি দলীল হিসাবে পেশ করেন,

«إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

“পূর্ব দিক থেকে যখন রাত এসে যাবে এবং পশ্চিম দিক থেকে যখন দিন চলে যাবে ও সূর্য ডুবে যাবে, তখন সাওম পালনকারী ইফতার করবে”।[9] তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি যেহেতু শর‘ঈ দলীলের আলোকে ইফতার করেছে, সেহেতু অন্য কোনো শর‘ঈ দলীলের আলোকে ছাড়া খানা-পিনা ত্যাগ করা তার জন্য জরুরি হবে না।

---

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১০০।

যেসব দেশে রাত বা দিন ২৪ ঘন্টারও বেশি সময়ে প্রলম্বিত, সেসব দেশে কীভাবে সাওম পালন করতে হবে?[১০]

বিবরণ: কিছু কিছু দেশে দিন বা রাত ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে অব্যাহত থাকে। এমনকি কোনো কোনো দেশে ৬ মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কীভাবে সাওম পালন করবে? অনুরূপভাবে কোনো কোনো দেশে ২৪ ঘন্টায় রাত-দিন হয়, কিন্তু রাত-দিনের কোনো একটি ২০ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত লম্বা হয়। তাদের সাওম পালনের নিয়মইবা কী হবে?

পর্যালোচনা: এসব দেশে যে সময় হিসাব করে সালাতের সময় নির্ধারণ করতে হবে, সে বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। নাউওয়াস ইবন সাম‘আন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

10 মূল বইয়ের ৪১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন, ৪০ দিন। প্রথম দিন এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো তোমাদের দিনগুলোর মতোই। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে আমাদের একদিনের সালাত কি যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। তোমরা ঐদিনের হিসাব করবে।”[11]

[11] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৩৭।

সময় হিসাব করে সালাত ও সাওমের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত হলেও কীভাবে সময় নির্ধারণ করতে হবে, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে তিনটি মত পাওয়া যায়:

প্রথম মত: বেশিরভাগ ওলামায়ে কেরামের মতে, ঐসব দেশের সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব দেশে রাত-দিনের স্বাভাবিক আবর্তন ঘটে এবং শরী‘আত নির্ধারিত আলামত অনুযায়ী সালাত ও সাওমের সময় জানা যায়, সেসব দেশের হিসাব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। ‘রাবেত্বাতুল আলাম আল-ইসলামী’-এর প্রতিষ্ঠান ‘ইসলামী ফিকহ একাডেমী’ এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদও এজাতীয় মত প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় মত: স্বাভাবিক হিসাব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ রাতকে ১২ ঘন্টা এবং দিনকে ১২ ঘন্টা হিসাব করতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের কোনো কোনো আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন,

যেহেতু ঐসব দেশে স্বাভাবিক সময় অনুযায়ী রাত-দিন হয় না, সেহেতু সেগুলোতে মধ্যমপন্থী কোনো এলাকার সময় অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। ঠিক ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর মতো, যার হায়েযের সময়ের নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই এবং সে রক্ত দেখে হায়েয ও ইস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। (তাকে যেমন মধ্যম সময় অর্থাৎ সর্বোচ্চ সময় হায়েয হিসেবে ধরে বাকী সময় সালাত আদায় করতে হয় তেমনি এ ব্যক্তিরাও তাই করবে)।

তৃতীয় মত: কতিপয় ফকীহের মতে, মক্কার সময় অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে। কেননা মক্কা হচ্ছে ‘উম্মুল ক্বুরা’ বা জনপদসমূহের মা এবং মুসলিমদের কিবলা, সেখান থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

মাসআলাটির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ যেসব দেশে রাত-দিন ২৪ ঘন্টায় হয়, কিন্তু রাত-দিনের কোনো একটি খুব বেশি সময় পর্যন্ত লম্বা হয়, সেসব দেশের সাওমের ধরণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের দুই রকম মত পাওয়া যায়:

প্রথম মত: দিন অত্যধিক লম্বা হোক বা অত্যধিক খাঁটো হোক ফজর উদয় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওম পালন করা এসব দেশের বাসিন্দাদের ওপর ওয়াজিব। তবে দিন যদি অত্যধিক লম্বা হয় এবং কেউ অসুস্থতার কারণে সাওম পালনে অক্ষম হয়, বা তার অসুখ বেড়ে যায়, বা আরোগ্য লাভের গতি মন্থর হয়ে যায়, অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে সাওম পালনে অক্ষম হয়, তাহলে সে সাওম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে।

‘রাবেত্বাতুল আলাম আল-ইসলামী’-এর প্রতিষ্ঠান ‘ইসলামী ফিকহ একাডেমী’ এবং সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদ এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছে। তারা বলেন, শরী‘আতের বিধান সব দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧]

“আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সাওম পূর্ণ কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ. বলেন, ‘যদি সেখানে রাত ও দিন হয়ে থাকে, তাহলে লম্বা হোক বা খাঁটো হোক রাত ও দিন ধর্তব্য হবে। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয়, রাত ৪ ঘন্টা এবং দিন ২০ ঘন্টা, তবুও রাতকে রাত এবং দিনকে দিন ধরতে হবে। তবে যদি সেখানে রাত ও দিনের ব্যাপার না থাকে, তাহলে সময় হিসাব করতে হবে। যেমন, সুমেরু ও কুমেরুর অঞ্চলসমূহ।

দ্বিতীয় মত: দিন বা রাত যেহেতু অত্যধিক লম্বা, সেহেতু হিসাব করে সময় নির্ধারণ করতে হবে। তবে সময় নির্ধারণের পদ্ধতি কী হবে তদ্বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, মক্কার সময় অনুযায়ী রাত-দিনের সময় নির্ধারণ করতে হবে। মিশরের আল-আযহারের ফাতওয়া বোর্ড এবং জর্ডানের ফাতওয়া বোর্ড এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব দেশে রাত ও দিন স্বাভাবিক গতিতে আবর্তিত হয়, সেসব দেশের সময় অনুযায়ী তারা সময় নির্ধারণ করবে।

সাওম পালনকারীর শ্বাসকষ্ট উপশমকারী স্প্রে (Inhaler/ইনহেলার বা Puffer/পাফার) ব্যবহারের বিধান[১২]

বিবরণ: অনেক মানুষ এ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টে ভোগে এবং তাদের অনেকেই স্প্রে ব্যবহার করে। এই স্প্রের বোতলের মধ্যে থাকে তরল ঔষধ, রাসায়নিক পদার্থ, ঔষধি অন্যান্য উপাদান এবং অক্সিজেন। স্প্রে চেপে ধরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে এই ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। মুখ দিয়ে এটি গলনালীতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে শ্বাসনালী হয়ে যকৃতে চলে যায়। এর কিছু অংশ গলনালীতে থেকে যায়। আবার এর খুব সামান্য পরিমাণ পেটের ভেতরেও প্রবেশ করে। এক্ষণে রামাযানের দিবসে সাওম পালনকারীর জন্য এই স্প্রে ব্যবহারের বিধান কী?

পর্যালোচনা: আধুনিক যুগের ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলায় দুই ধরণের মতামত পেশ করেছেন:

---

[12] মূল বইয়ের ৪১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথম মত: রমযানের দিনের বেলায় সাওম পালনকারীর এই স্প্রে ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। এটি সাওম ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা স্প্রের যে অংশ পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে, তা খুবই সামান্য। ফলে কুলি করলে ও নাকে পানি দিলে যেমন খুব সামান্য পরিমাণ পানি ভেতরে গেলেও সাওম ভেঙ্গে যায় না, ঠিক তেমনি স্প্রের এই সামান্য অংশও সাওম ভঙ্গকারী গণ্য হবে না।

আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক, শ্বাসকষ্ট উপশমকারী একটি স্প্রের বোতলে সব মিলিয়ে ১০ মি. লি. তরল থাকে, যা দিয়ে ২০০ বার স্প্রে করা যায়। দেখা যায়, প্রত্যেক বার স্প্রেতে এক ফোটারও কম তরল পদার্থ থাকে। এই এক ফোটারও কম তরল পদার্থ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় ভাগটি প্রবেশ করে শ্বাসনালীতে, ছোট ভাগটি থেকে যায় গলনালীতে এবং খুব সামান্য পরিমাণ পেটে প্রবেশ করতে পারে। এই অতি সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ কোনো ব্যাপার না, যেমনিভাবে কুলি ও নাকের সামান্য অংশ পানি ব্যাপার না, বরং কুলি করলে ও নাকি পানি

দিলে যে পরিমাণ পানি ভেতরে প্রবেশ করে, তা স্প্রের ভেতরে প্রবেশকারী অংশের চেয়ে বেশি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, স্প্রের কিছু অংশ যে পাকস্থলীতে প্রবেশ করবেই তা কিন্তু নিশ্চিত নয়; প্রবেশ করতেও পারে, নাও পারে। নিয়ম হচ্ছে, নিশ্চিত কোনো বিষয় সন্দেহপূর্ণ কোনো বিষয়ের দ্বারা বিদূরিত হবে না (اليقين لا يزول بالشك)।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ডাক্তারগণ বলে থাকেন, আরাক গাছের মিসওয়াকে আট প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা দাঁত ও মাঢ়িকে রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করে। পদার্থগুলো লালার সাথে মিশে গলনালীতে প্রবেশ করে। আমের ইবন রবী‘আহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ» مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ»

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাওম পালন অবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে

দেখেছি”।[13] মিসওয়াকের ঐ পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণ হওয়ার কারণে এবং উদ্দিষ্ট না হওয়ার কারণে পাকস্থলীতে পৌঁছা সত্ত্বেও তা সাওমের কোনো ক্ষতি করে না। অনুরূপভাবে ঠিক একই কারণে স্প্রের যে সামান্য অংশ ভেতরে প্রবেশ করে, তাও সাওমের কোনো ক্ষতি করবে না।

সঊদী আরবের ফাতওয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটি এই মত গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: শ্বাসকষ্ট উপশমকারী স্প্রে (ইনহেইলার) গ্রহণে সাওম ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং যরূরী প্রয়োজনে যদি সাওম অবস্থায় রোগীকে এই স্প্রে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে তাকে ঐ দিনের সাওম কাযা আদায় করতে হবে। মুহাম্মাদ তাক্বীউদ্দীন উসমানী এবং ড. ওয়াহবা যুহায়লী এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছেন।

---

[13] তিরমিযী, হাদীস নং ৭২৫। তিনি হাদীসটিকে ‘হাসান সহীহ বলেছেন।

তাদের দলীল হচ্ছে, যেহেতু এই স্প্রের উপাদান পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে, সেহেতু তা সাওম ভঙ্গ করবে। তাদের মতে, যারা বলছেন যে, এটি পাকস্থলীতে যায় না; বরং শ্বাসনালীতে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। ফলে, এর সামান্য অংশ হলেও যেহেতু পাকস্থলীতে যায়, সেহেতু তা সাওম ভঙ্গ করবে।

সাওম পালনকারীর অক্সিজেন নেওয়ার বিধান[১৪]

বিবরণ: শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যার কারণে সহজভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। অক্সিজেন এক ধরণের বায়ু, যাতে খাদ্য জাতীয় কোনো পদার্থ থাকে না। এর বেশিরভাগই যায় শ্বাসনালীতে। এক্ষণে, রামাযানের দিবসে সাওম পালনকারীর জন্য এই অক্সিজেন ব্যবহারের হুকুম কী?

হুকুম: অক্সিজেন সাওম ভঙ্গকারী বিষয় হিসাবে গণ্য হবে না। অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সাথে স্বাভাবিক বায়ু গ্রহণের মতোই।

---

14 মূল বইয়ের ৪২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাওমপালনকারীর জন্য নাকের ড্রপ ব্যবহারের বিধান[১৫]

বিবরণ: কোনো কোনো সময় মানুষ এমন অসুখে আক্রান্ত হয় যে, তার জন্য নাকের ড্রপ ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন, কেউ দীর্ঘস্থায়ী সর্দিতে আক্রান্ত হলে বা নাকে এলার্জির সমস্যা থাকলে ড্রপ ব্যবহার করতে হয়। এক্ষণে, রামাযানের দিবসে সাওম পালনকারীর জন্য নাকের এই ড্রপ ব্যবহারের হুকুম কী?

হুকুম: আধুনিক যুগের ফকীহগণ এই মাসআলায় ৩ ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথম অভিমত: নাকের ড্রপ মোটেও সাওম ভঙ্গ করবে না। কেননা

প্রথমত: ড্রপের মাধ্যমে যে উপাদানটুকু পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে, তা খুবই অল্প। ছোট্ট একটি চামচের তরল পদার্থকে ৭৫ ভাগে ভাগ করলে এর মাত্র ১ ভাগ

---

15 মূল বইয়ের ৪২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে। কুলি করলে যতটুকু পানি পাকস্থলীতে যায়, তার চেয়ে এর পরিমাণ আরো কম। সুতরাং কুলি করলে যেমন সাওম ভঙ্গ হয় না, নাকের ড্রপ ব্যবহার করলেও তেমনি সাওম ভঙ্গ হবে না।

দ্বিতীয়ত: নাকের এই ড্রপ এক দিকে যেমন খুবই অল্প, অন্য দিকে তেমনি তা খাদ্যের কাজও দেয় না; বরং কোনো অবস্থাতেই একে খাদ্য বা পানীয় কোনোটাই গণ্য করা হয় না। আর আল্লাহ সাওম ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য খাদ্য ও শক্তি সঞ্চারকারী হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।

দ্বিতীয় অভিমত: নাকের ড্রপ সাওম ভঙ্গ করবে। বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা এই মত ব্যক্ত করেছেন, শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীন রহ. তাদের অন্যতম। লাক্বীত ইবন সবিরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

“নাকের ভেতর অতি উত্তমরূপে পানি দিবে, তবে যখন তুমি সাওম অবস্থায় থাকবে, তখন নয়”।[16]

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, পাকস্থলীতে পৌঁছতে পারে এমন কোনো ড্রপ নাকে ব্যবহার করা সাওম পালনকারীর জন্য জায়েয নেই। আর হাদীস, বাস্তবতা ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে একথা সবারই জানা যে, নাক কণ্ঠনালীর প্রবেশ পথ।

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে, নাক প্রথমে কণ্ঠনালী, অতঃপর পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম রাস্তা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও এটি প্রমাণ করেছে। বিশেষ করে ‘অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা’ (এ্যানাটমি/Anatomy) সন্দেহের এতটুকু সুযোগ রাখে নি যে, নাকের সাথে কণ্ঠনালীর গভীর যোগসূত্র রয়েছে।

তৃতীয় অভিমত: বর্তমান যুগের কোনো কোনো আলেমের মতে, নাকের ড্রপ ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যদি

---

[16] সুনান আবু দাঊদ, হাদীস নং ১৪২।

এর কোনো অংশ কণ্ঠনালী পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে তা সাওম ভঙ্গ করবে না। যেমন, কেউ তা নাকের এক প্রান্তে ব্যবহার করল। পক্ষান্তরে, যদি এর কোনো অংশ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে তা সাওম ভঙ্গ করবে।

তাঁরা মূলতঃ উল্লিখিত উভয় পক্ষের দলীলসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তাদের মতেও, ভেতরে যতটুকু যায়, তার পরিমাণ খুবই সামান্য; কুলি করার পরে যতটুকু লাবণ্য মুখের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, ঠিক তার মতই। আর এই সামান্য অংশ সাওমের কোনো ক্ষতি করবে না মর্মে ইজমা‘ রয়েছে।

সাওম পালনকারীর জন্য কানের ড্রপ ব্যবহারের বিধান[১৭]

বিবরণ: কেউ কেউ কানে নানা সমস্যা অনুভব করে। ফলে তাদেরকে কখনও কখনও এমন ঔষধ দেওয়া হয়, যা কানে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষণে, রামাযানের দিবসে সাওম পালনকারীর জন্য কানের এ জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের হুকুম কি?

হুকুম: ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলায় ২ ধরণের বক্তব্য পেশ করেছেন:

প্রথম মত: হানাফী, মালেকী এবং শাফে'ঈদের বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী, কানে তেল দিলে বা পানি দিলে সাওম ভেঙ্গে যাবে, তবে হাম্বলীদের মতানুযায়ী, তা যদি মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে সাওম ভঙ্গ হবে।

---

[17] মূল বইয়ের ৪২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাদের মতে, কানে যা প্রয়োগ করা হয়, তা যেহেতু কণ্ঠনালী বা মস্তিষ্কে যায়, সেহেতু তা সাওম ভঙ্গ করবে।

দ্বিতীয় মত: ইবন হাযমের মত ও শাফে'ঈদের ভিন্ন আরেকটি মতানুযায়ী, কানে প্রয়োগকৃত ঔষধ সাওম ভঙ্গ করবে না। তাদের যুক্তি হচ্ছে, কানে প্রয়োগকৃত ঔষধ মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে না, তবে তা শিরা-উপশিরা ও লোমকূপের মাধ্যমে পৌঁছে।

মূলতঃ উভয় মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা কানে প্রয়োগকৃত ঔষধ পেটে প্রবেশ করে কিনা সেটিই এখানে মূল বিষয়। আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে যে, কান এবং পেট ও মস্তিষ্কের মধ্যে এমন কোনো নালা নেই, যেখান দিয়ে তরল পদার্থ প্রবেশ করতে পারে। তবে কানের পর্দায় ছিদ্র থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই তথ্যানুযায়ী প্রত্যেকের মতামতের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, কানের ড্রপ সাওম ভঙ্গ করে না।

তবে যদি কানের পর্দা না থাকে, তাহলে ‘ইউস্টেশন টিউব’ (Eustachian tube) নামক নালার মাধ্যমে গলবিলের সাথে কানের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে কান নাকের মতো হয়ে যায়। অতএব, নাকের ড্রপ ব্যবহারের যে বক্তব্য গত হয়ে গেছে, এখানেও সেই একই বক্তব্য প্রযোজ্য হবে।

সাওম পালনকারীর জন্য চোখের ড্রপ ব্যবহারের বিধান[১৮]

বিবরণ: কেউ কেউ চোখের নানা রোগে ভোগে। ফলে তাদেরকে কখনও কখনও এমন ঔষধ দেওয়া হয়, যা চোখে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষণে, রমযানের দিবসে সাওম পালনকারীর জন্য চোখের এ জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের হুকুম কী?

হুকুম: সুরমা বা এ জাতীয় অন্য কিছু চোখে দিলে সাওম ভাঙ্গবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের ভিন্ন মত প্রকাশের কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ কি মুখের মতো পেটে কোনো কিছু প্রবেশের পথ হিসেবে গণ্য হবে নাকি চোখ ও পেটের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই? নাকি চোখে প্রয়োগকৃত ঔষধ পেটে প্রবেশ করে শিরা-উপশিরার মাধ্যমে?

---

[18] মূল বইয়ের ৪৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* হানাফী ও শাফে‘ঈদের নিকট চোখ ও পেট বা চোখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে কোনো প্রবেশ পথ নেই। ফলে তাদের মতে, চোখে ঔষধ দিলে সাওম ভাঙ্গবে না।

* পক্ষান্তরে মালেকী ও হাম্বলীদের নিকট, মুখ ও নাকের মত চোখও কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পথ। অতএব, সাওম পালনকারী যদি চোখে সুরমা ব্যবহার করে এবং গলনালীতে তার স্বাদ পায়, তাহলে তার সাওম ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. সুরমা ব্যবহারের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন এবং তাঁর কাছে সুরমা সাওম ভঙ্গ করবে না বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাওম পালনকারীর জন্য সুরমা ব্যবহারের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম তিরমিযী রহ.

বলেছেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না"।[19]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, চোখ, কান, অতঃপর গলনালী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে একটি বিশেষ নালা রয়েছে।

চোখের ড্রপের ব্যাপারে আগের যুগের ওলামায়ে কেরামের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে কানের ড্রপ ও চোখের সুরমার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাদের নিকট মূলনীতি হচ্ছে, চোখ পেটে কোনো কিছু পৌঁছার প্রবেশ পথ কিনা। সুতরাং আমরা যদি আগেকার ফকীহগণের নিকট চোখের ড্রপ ব্যবহারের হুকুম জানতে চাই, তাহলে সুরমার ব্যাপারে তাদের মতভেদ জানলেই চলবে।

তবে বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরাম চোখের ড্রপের ব্যাপারে দুই রকম মত প্রকাশ করেছেন:

---

[19] জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৭২৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রথম মত: শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীন, ওয়াহবা যুহায়লীসহ বর্তমান যুগের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট চোখের ড্রপ সাওম ভঙ্গ করবে না।

কারণ চোখের ভেতরে এক ফোটার বেশি তরল পদার্থ ধরে না। আর এই এক ফোটার পরিমাণ খুবই অল্প। কেননা ছোট্ট একটি চামমের ধারণ ক্ষমতা ৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল পদার্থ। আর প্রত্যেক ঘন সেন্টিমিটার ১৫ ফোটা সমপরিমাণ। ফলে ছোট্ট একটি চামচে বিদ্যমান তরল পদার্থের ৭৫ ভাগের ১ ভাগ হচ্ছে ১ ফোটা। অন্যভাবে বলা যায়, ১ ফোটা তরল পদার্থের পরিমাণ ০.০৬ ঘন সেন্টিমিটার।

অতএব, যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, ১ ফোটার পরিমাণ খুবই সামান্য, সেহেতু তা সাওম ভঙ্গ করবে না। কেননা কুলি করার পরে যতটুকু লাবণ্য মুখের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, এর পরিমাণ তার চেয়েও কম। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই ১ ফোটা তরল পদার্থ 'অশ্রু

ক্ষরণকারী গ্রন্থি’ (ল্যাকরিমাল ডাকট/Lacrimal Duct) দিয়ে অতিক্রমের সময় পুরোটাই শোষিত হয়ে যায়। ফলে তা গলনালী পর্যন্ত পৌঁছে না। তবে মুখে যে স্বাদ অনুভূত হয়, তা ঐ তরল পদার্থ গলনালী পর্যন্ত পৌঁছার কারণে নয়; বরং জিহ্বার কারণে। কেননা একমাত্র জিহ্বাই হচ্ছে মানবদেহেরে স্বাদ আস্বাদন যন্ত্র। আর তরল ঐ বিন্দু যখন শোষিত হয়, তখন তা জিহ্বার স্বাদ আস্বাদনের এলাকায় চলে যায়। ফলে রোগী স্বাদ অনুভব করে।

আরো একটি বিষয় হচ্ছে, চোখের ড্রপের ব্যাপারে শরী‘আতের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া চোখ পানাহারের কোনো রাস্তাও নয়। যেমন, যদি কেউ তার দুই পায়ের পাতায় কোনো কিছু মাখায় এবং মুখে তার স্বাদ অনুভব করে, তাহলে তা তার সাওম ভাঙ্গবে না। কেননা তা পানাহারের রাস্তা নয়।

দ্বিতীয় মত: চোখের ড্রপ সাওম ভাঙ্গবে। এই মতাবলম্বীরা চোখের ড্রপকে সুরমার ওপর ক্বিয়াস করেছেন। সুরমা যেমন কণ্ঠনালীতে গেলে সাওম ভেঙ্গে যায়, তেমনি

চোখের ড্রপও কণ্ঠনালীতে গেলে সাওম ভেঙ্গে যাবে। তাছাড়া অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিশেষজ্ঞরা (Anatomist) প্রমাণ করেছেন যে, মহান আল্লাহ এমন নালীর সমন্বয়ে চোখ সৃষ্টি করেছেন, যার সাথে নাকের, অতঃপর গলনালীর সম্পর্ক রয়েছে।

জিহ্বার নিচে যে ট্যাবলেট রাখা হয়, সাওম পালনকারীর জন্য তা ব্যবহারের বিধান[২০]

বিবরণ: জিহ্বার নিচে ঔষধ রাখলে, শরীর তা সবচেয়ে দ্রুতগতিতে টেনে নেয়। সেজন্য হৃদরোগীদের জন্য বিশেষ ট্যাবলেট তৈরী করা হয়, যা ‘অ্যানজাইনা পেকটারিস’ (Angina pectoris) নামক হৃদরোগ এবং হার্টে রক্তের জমাটবদ্ধতা (Thrombosis/থ্রমবোসিস) প্রশমন করে। রোগী জিহ্বার নীচে এই ট্যাবলেট রাখা মাত্র খুব অল্প সময়েই দেহ তা টেনে নেয় এবং রক্তের মাধ্যমে হার্টে পৌঁছে যায়। আর এই ট্যাবলেটের কোনো অংশই পেটে প্রবেশ করে না। এক্ষণে রামাযানের দিবসে এই ট্যাবলেট ব্যবহারের হুকুম কী?

হুকুম: এই ট্যাবলেটের গলিত অংশকে কণ্ঠনালীতে পৌঁছা রোধ করলে তা সাওম ভঙ্গ করবে না। কেননা একদিকে

---

[20] মূল বইয়ের ৪৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যেমন এর কোনো অংশ পেট পর্যন্ত যায় না, তেমনি তা খাদ্য বা পানীয়ও নয়।

সাওম পালনকারীর জন্য পাকস্থলী পর্যবেক্ষণ যন্ত্র (Gastroscope/গ্যাস্ট্রোস্কোপ) ব্যবহারের বিধান[২১]

বিবরণ: আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষ সাধনের ফলে বর্তমান এমন এক ধরণের চিকিৎসা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মুখ, গলনালী, অতঃপর খাদ্যনালী দিয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত প্রবেশ করে। এর মাধ্যমে পাকস্থলীর ঘা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য পাকস্থলীর ভেতরের ছবি তোলা হয়, অথবা পরীক্ষার জন্য পাকস্থলী থেকে ছোট্ট নমুনা বের করা হয়। এক্ষণে, রামাযানের দিবসে সাওম পালনকারীর জন্য এই যন্ত্র ব্যবহারের হুকুম কী?

[21] মূল বইয়ের ৪৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হুকুম: পাকস্থলীতে যে কোনো কিছু প্রবেশ করলেই কি সাওম ভেঙ্গে যাবে নাকি খাদ্য প্রবেশ শর্ত? ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেছেন:

প্রথম মত: অধিকাংশের মতে, পেটে যা কিছুই প্রবেশ করুক না কেন তা সাওম ভঙ্গ করবে। এমনকি কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এক টুকরা লোহা, বা কঙ্কর বা অন্য কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার সাওমও ভেঙ্গে যাবে। তবে হানাফী আলেমগণ শর্তারোপ করেছেন যে, ঐ জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে পেটের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ যদি তার কিছু অংশ বাইরে থেকে যায় বা বাইরের কোনো কিছুর সাথে তা সম্পর্কিত থাকে, তাহলে সাওম ভাঙ্গবে না।

তাদের দলীল হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম পালনকারীকে সুরমা পরিহার করতে বলেছেন[22]। অবশ্য ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু

[22] সুনান আবু দাঊদ, হাদীস নং ২৩৭৯।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না"।[23] উক্ত হাদীসের আলোকে তারা বলছেন, সুরমায় কোনো খাদ্য উপাদান নেই। অতএব, সাওম ভঙ্গের জন্য পেটে প্রবেশকারী জিনিসটাকে খাদ্য হওয়া শর্ত নয়।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»

"যা প্রবেশ করে, তার কারণে সাওম ভঙ্গ হয়; যা বের হয়, তার কারণে নয়"।[24] ইমাম বুখারী রহ. 'মু'আল্লাক্ব' হিসাবে, তবে 'নিশ্চিত শব্দ' (صِيْغَةُ الْجَزْمِ) ব্যবহার করে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন[25]।

---

[23] জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৭২৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[24] বায়হাকী, সুনান কুবরা, ৪/২৬১।

[25] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৭।

তাঁরা আরো বলেন, পেটে প্রবেশ করে এমন সব কিছু থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। কিন্তু যে ঐ যন্ত্র ব্যবহার করল, সে সব কিছু থেকে বিরত থাকল না।

অতএব, অধিকাংশের মতানুসারে, গ্যাস্ট্রোস্কোপ সাওম ভঙ্গ করবে; কিন্তু হানাফীদের শর্তানুসারে, তা সাওম ভঙ্গ করবে না। কেননা বাইরের কোনো কিছুর সাথে তা সম্পর্কিত থাকে।

দ্বিতীয় মত: কারো কারো মতে, খাদ্য, পানীয় বা এ জাতীয় কোনো কিছু ছাড়া ভিন্ন কিছু পাকস্থলীতে গেলে তা সাওম ভঙ্গ করবে না। কেননা কুরআন-হাদীসে খাদ্য ও পানীয় বলতে মানুষের স্বাভাবিক প্রসিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়কে বুঝানো হয়েছে। খাদ্য ও পানীয় বলতে নিশ্চয় কঙ্কর, কয়েন ইত্যাদিকে বুঝানো হয় নি।

তবে তারা শর্তারোপ করেছেন যে, গ্যাস্ট্রোস্কোপ-এর সঙ্গে যেন কোনো প্রকার তরল বা তৈলাক্ত পদার্থ ভেতরে না যায়। যদি যায়, তাহলে ঐ পদার্থের কারণে সাওম ভঙ্গ হবে; গ্যাস্ট্রোস্কোপ-এর কারণে নয়। শাইখুল ইসলাম

ইবন তায়মিয়্যাহ ও শাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীন রহ. এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছেন।

অবশকারক/অনুভূতিনাশক ঔষধ/অবেদন পদ্ধতি (Anesthesia/এনেসথেসিয়া) সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা[২৬]

বিবরণ: বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু অপারেশনে অবশ করে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অবশ দুই ধরণের হয়ে থাকে: ১. সম্পূর্ণ অবশ, ২. নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ অবশ। আর কয়েকভাবে অবশ করা হয়ে থাকে। যেমন,

ক. নাকের মাধ্যমে অবশ: এই পদ্ধতিতে রোগী গ্যাসীয় এক প্রকার পদার্থ শুঁকে, যা তার স্নায়ুতে প্রভাব ফেলে। এভাবে অবশ হয়ে যায়।

খ. শুষ্ক অবশ/অবেদন: এটি চীনের এক ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি। এতে রোগীর ইন্দ্রিয়ে চামড়ার নিচে তরল বা বায়বীয় আকারে নয় এমন কঠিন ও শুষ্ক সুঁই প্রবেশ করানো হয়। এর বিশেষ কার্যকারিতায় রোগী অনুভূতি ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে

---

[26] মূল বইয়ের ৪৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ অবশ করা হয়। এতে শরীরের অভ্যন্তরে কোনো কিছু প্রবেশ করে না।

গ. ইনজেকশনের মাধ্যমে অবশ: এই পদ্ধতিতে কখনও নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ, আবার কখনও রোগীকে সম্পূর্ণরূপে অবশ করা হয়। তবে রোগীকে সম্পূর্ণরূপে অবশ করার সময় দ্রুত কার্যকরী ওষুধের মাধ্যমে শিরায় ইনজেকশন দেওয়া হয়। এতে রোগী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে যায়। এরপর নাকের মাধ্যমে শ্বাসনালীতে সরাসরি পাইপ প্রবেশ করানো হয়। অতঃপর যন্ত্রের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিনাশক গ্যাসীয় পদার্থও ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। এক্ষণে, এসব অবেদন পদ্ধতি সাওমে কি ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে?

হুকুম: ইনজেকশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে অবশ করার পদ্ধতি ছাড়া উল্লেখিত আর কোনো পদ্ধতি সাওম ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে না। প্রথম পদ্ধতিতে নাকের মধ্যে যে গ্যাসীয় পদার্থ প্রবেশ করানো হয়, তার একদিকে যেমন

কোনো বাহ্যিক অবয়ব নেই, অন্যদিকে তেমনি তাতে কোনো খাদ্য উপাদানও নেই। অতএব, তা সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে না। আর চীনের পদ্ধতি এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ অবশ করার পদ্ধতিতে যেহেতু পেটে কোনো প্রকার পদার্থ প্রবেশ করে না, সেহেতু তাও সাওম ভঙ্গ করবে না।

তবে সাওম পালনকারী রোগীকে ইনজেকশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে অবশ করলে সে পুরোপুরি অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়। আর সাওম পালনকারী অনুভূতিশূন্য হলে তার সাওম ভাঙ্গবে কিনা সে বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অনুভূতি লোপ দুই ধরণের হয়ে থাকে:

এক. সারা দিন অনুভূতিশূন্য থাকা: অধিকাংশ ফক্বীহ্‌র নিকট, সারা দিন কারো অনুভূতি না থাকলে তার সাওম শুদ্ধ হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলেন,

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

“সাওম ব্যতীত বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের। সাওম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব”।

সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي»

“সে আমার জন্য তার যৌন বাসনা এবং খানা পরিত্যাগ করেছে”।[27] হাদীসে এসব বিষয় বর্জন সাওম পালনকারীর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে; কিন্তু কোনো বেহুশের ক্ষেত্রে এমন সম্বন্ধ যথাযথ হবে না।

মুহাম্মাদ উসাইমীন রহ. এই মত সমর্থন করেছেন।

কারো কারো মতে, ঐ সাওম পালনকারীর সাওম শুদ্ধ হবে। কেননা সে সাওমের নিয়্যত করেছে। আর অনুভূতিশূন্য হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঠিক ঘুমের মত; এতে কোনো ক্ষতি হবে না।

---

[27] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫১।

দুই. দিনের কিছু অংশ অনুভূতিশূন্য থাকা: ইমাম মালেক রহ.-এর মতে, এমতাবস্থায় তার সাওম শুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফে‘ঈ ও আহমাদ রহ.–এর মতে, সে দিনের যে কোনো অংশে জ্ঞান ফিরে পেলে তার সাওম শুদ্ধ হবে।

খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ ইনজেকশন সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা[২৮]

বিবরণ: কিছু কিছু রোগীকে ইনজেকশনের মাধ্যমে খাবার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। গ্লুকোজ, লবন ও পানির সমন্বয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়। কখনও কখনও এতে ঔষধি উপাদানও যুক্ত করা হয়। রোগীর শিরায় এই ইনজেকশন দেওয়া হয়। ফলে, তা পাকস্থলীতে না যেয়ে সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে। কিন্তু তা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। সেজন্য, রোগী কোনো প্রকার পানাহার না করে শুধু এর ওপর নির্ভর করেই লম্বা সময় বেঁচে থাকতে পারে। এক্ষণে এসব খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ ইনজেকশন কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?

হুকুম: এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দুই ধরণের মত পাওয়া যায়:

---

28 মূল বইয়ের ৪৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথম মত: এই ইনজেকশন সাওম ভঙ্গ করবে। শাইখ আব্দুর রহমান সা‘দী, শাইখ ইবন বায, শাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীনসহ আধুনিক যুগের বেশিরভাগ আলিম এই মত অবলম্বন করেছেন। ‘আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমী’-ও এই মত সমর্থন করেছে।

তাদের দলীল হচ্ছে, যেহেতু এই ইনজেকশন খাদ্যের কাজ করে, সেহেতু তা সাওম ভঙ্গ করবে।

দ্বিতীয় মত: কতিপয় আলিমের মতে, এই ইনজেকশন সাওম ভঙ্গ করবে না।

তাদের দলীল হচ্ছে, যেহেতু এর কোনো অংশই স্বাভাবিক প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে না, সেহেতু তা সাওম ভঙ্গ করবে না। আর ভেতরে কিছু অংশ গেলেও তা যায় মানবদেহের কূপ দিয়ে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ভেতরে যে অংশ যায়, তা পেট পর্যন্ত পৌঁছে না।

ঔষধি ইনজেকশন সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা[২৯]

বিবরণ: খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ ইনজেকশন ছাড়া অন্যান্য যেসব ইনজেকশন বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলোই ঔষধি ইনজেকশন। এগুলো কখনও চামড়ায় দেওয়া হয়; যেমন, ইনসুলিন। আবার কখনও মাংসপেশী বা শিরায় দেওয়া হয়। এসব ইনজেকশন পাকস্থলী পর্যন্ত যায় না। এক্ষণে সাওমে এর কী ধরণের প্রভাব রয়েছে?

হুকুম: আধুনিক কালের প্রায় সকল আলিমের মতে, উল্লিখিত ইনজেকশন সাওম ভঙ্গ করবে না। 'আন্তর্জাতিক ফিক্বহ একাডেমী', সঊদী আরবের 'আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিইয়া ওয়াল-ইফতা' এবং 'দারুল ইফতা আল-মিছরিইয়া'-ও এই ফাতওয়া দিয়েছে।

---

[29] মূল বইয়ের ৪৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তারা বলেন, এসব ইনজেকশন খাদ্য, পানীয় বা এ জাতীয় কোনো কিছু নয় বলে সেগুলো সাওম ভঙ্গ করবে না।

সাওম পালনকারীর জন্য নিকোটিন গাম বা নিকোটিন প্যাচ (Nicotine Patch) ব্যবহারের বিধান[৩০]

বিবরণ: এক প্রকার প্যাচ, গাম বা প্লাস্টার আছে, যা শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিকোটিন ছাড়ে। চামড়ার অভ্যন্তরে রয়েছে রক্ত নালী (Blood vessel)। ফলে চামড়ার উপরে যা রাখা হয়, তা কৈশিক নালীর (Capillary vessel) মাধ্যমে শোষিত হয়ে রক্তে গিয়ে মিশে। তবে এর শোষণ ক্ষমতা খুবই ধীর গতি সম্পন্ন। এভাবে তা ধূমপায়ীকে ধূমপান ত্যাগে সাহায্য করে। এক্ষণে, সাওমে এর কি কোনো প্রভাব রয়েছে?

হুকুম: সুরমা এবং যেসব ঔষধ মুখ-নাক ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করা হয়, সেসব সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবন তায়মিয়্যাহ রহ-এর এক বিস্তারিত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, নিকোটিন প্যাচ সাওম ভঙ্গ করবে

---

[30] মূল বইয়ের ৪৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না, তবে বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

প্রথম মত: এই প্যাচ বা গাম সাওম ভঙ্গ করবে না। ‘আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমী’ এই বক্তব্য সমর্থন করেছে।

দ্বিতীয় মত: নিকোটিন প্যাচ সাওম নষ্ট করে দিবে। সঊদী আরবের ‘আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিইয়া ওয়াল-ইফতা’ এই পক্ষ সমর্থন করেছে। ‘আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ’-এর ওলামায়ে কেরাম প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে ধূমপান থেকে তওবা করার তাওফীক্ব দিন এবং আপনাকে তা পরিত্যাগ করতে সাহায্য করুন। কেননা সিগারেটে রয়েছে নিছক ক্ষতি; কোনো প্রকার কল্যাণ এতে নেই। ধূমপান পরিত্যাগে সহায়ক হিসাবে সাওম অবস্থায় যে প্যাচ, গাম বা প্লাস্টার ব্যবহারের কথা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, সে সম্পর্কে আমরা বলবো, আপনার জন্য এটির ব্যবহার জায়েয নয়।

কেননা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, এই নিকোটিন প্যাচ দেহে নিকোটিন সরবরাহ করে এবং তা রক্ত পর্যন্ত পৌঁছে। সুতরাং সিগারেট যেমন সাওম নষ্ট করে দেয়, এই প্লাস্টারও তেমনি সাওম নষ্ট করে দিবে। ফলাফল একই। আপনাকে এই পদ্ধতি ছেড়ে ধূমপান ত্যাগের ওপর দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কত ধূমপায়ী আল্লাহর কাছে তওবা করেছে এবং এই পদ্ধতির ব্যবহার ছাড়াই ধূমপান বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু বর্জন করে, আল্লাহ তাকে তার চেয়েও উত্তম বদলা দান করেন। আল্লাহই তাওফীকদাতা!’[31]

---

[31] আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিইয়া ওয়াল-ইফতা, ফাতওয়া নং ২১৭৩৪।

সাওম পালনকারীর জন্য মালিশ, মলম ও প্লাস্টার ব্যবহারের বিধান[৩২]

বিবরণ: চামড়ার অভ্যন্তরে রয়েছে রক্ত নালী (Blood vessel)। ফলে চামড়ার উপরে যা দেওয়া হয়, তা কৈশিক নালীর (Capillary vessel) মাধ্যমে শোষিত হয়ে রক্তে গিয়ে মিশে, তবে এর শোষণ ক্ষমতা খুবই ধীর গতি সম্পন্ন। যাহোক, সাওম পালনকারী যদি চামড়ায় মালিশ, মলম ও প্লাস্টার ব্যবহার করে, তাহলে কি তার সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?

হুকুম: এর হুকুম আগের মাসআলার হুকুমের মত, অর্থাৎ সুরমা এবং যেসব ঔষধ মুখ-নাক ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করা হয়, সেসব সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়্যাহ রহ.-এর এক বিস্তারিত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, মালিশ, মলম ও প্লাস্টার সাওম ভঙ্গ

---

[32] মূল বইয়ের ৪৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করবে না। ‘ইসলামী সাহায্য সংস্থা’-ও এই মতাবলম্বন করেছে।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, ঔষধি ইনজেকশন সরাসরি রক্তে দেওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তা সাওম ভঙ্গ করে না, সেহেতু আরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব মালিশ, মলম ইত্যাদি সাওম ভঙ্গ করবে না। বর্তমান যুগের কেউ কেউ বলেছেন, সকলেই একমত যে, এসব মালিশ, মলম ইত্যাদি সাওম ভঙ্গ করবে না।

ক্যাথেটার (Catheter) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে? [৩৩]

বিবরণ: রোগীর মূত্রনালীতে বিশেষ এক ধরণের প্লাস্টিক পাইপ লাগানো হয়, যা রোগীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেশাব নির্গত করে। এটিই হচ্ছে, ক্যাথেটার। এর মাধ্যমে নির্গত পেশাব একটি ব্যাগে গিয়ে জমা হয়। রোগীকে ডাক্তার ক্যাথেটার দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, রোগীর স্বাভাবিক পেশাব না হওয়া অথবা তার টয়লেটে যেতে সমস্যা হওয়া। এই ক্যাথেটার ব্যবহার সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কি?

হুকুম: কেউ তার মূত্রনালীতে তরল বা তেল জাতীয় কিছু প্রবেশ করালে তার সাওম নষ্ট হবে কিনা সে বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহগণ গবেষণা করেছেন এবং তারা দ্বিমত পোষণ করেছেন:

---

[33] মূল বইয়ের ৪৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথম মত: অধিকাংশ ফকীহর মতে, মূত্রনালীতে ফোঁটায় ফোঁটায় কিছু প্রবেশ করালে সাওম ভাঙ্গবে না। কেননা লিঙ্গের অভ্যন্তর এবং পেটের মধ্যে কোনো রাস্তা নেই। অতএব, মূত্রনালীতে ফোটায় ফোটায় কিছু প্রবেশ করালে সাওম ভাঙ্গবে এমন কথা বলার কোনো সুযোগই নেই।

দ্বিতীয় মত: কারো কারো মতে, মূত্রনালীতে ফোঁটায় ফোঁটায় কিছু প্রবেশ করালে সাওম ভাঙ্গবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এই মতের প্রবক্তা, তবে তিনি শর্ত করেছেন যে, সাওম নষ্ট হওয়ার জন্য ঐ জিনিসটাকে মূত্রাশয় পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কেননা মূত্রাশয় এবং পেটের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।

তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ ছাফ বলে দিয়েছেন যে, মূত্রাশয় এবং পাকস্থলীর মধ্যে দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণের বক্তব্য প্রথম মতকে শক্তিশালী করে। অর্থাৎ ক্যাথেটার সাওমের বিশুদ্ধতায়

কোনো প্রভাব ফেলবে না। ‘আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমী’ এই মত সমর্থন করেছে।

তবে দ্বিতীয় মতানুযায়ী ক্যাথেটার সাওম ভঙ্গ করবে।

হেমো-ডায়ালাইসিস (Hemodialysis) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?[৩৪]

বিবরণ: মানব দেহের অন্যতম প্রধান কাজটি করে থাকে কিডনী। বিষ, অন্যান্য তরল পদার্থ এবং অতিরিক্ত লবণ থেকে শরীরের রক্ত পরিশোধনের কাজটি সে করে থাকে। কিডনীর ক্রিয়া অকেজো হয়ে গেলে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে কিডনী ধোয়ার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং জীবনের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। ডায়ালাইসিস-এর প্রকারের মধ্যে হেমো-ডায়ালাইসিস অন্যতম। এক্ষণে, সাওমে এর কোনো প্রভাব আছে কি?

হুকুম: দুইভাবে কিডনী ডায়ালাইসিস করা হয়:

১. হেমো-ডায়ালাইসিস: এই পদ্ধতিতে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কিডনী ডায়ালাইসিস করা হয়। এক্ষেত্রে শরীরের রক্ত নিয়ে বিশেষ ঐ যন্ত্রে দেওয়া হয় এবং যন্ত্র

---

[34] মূল বইয়ের ৪৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে রক্ত পরিশোধন করে শিরা দিয়ে আবার তা শরীরে ফিরিয়ে দেয়। এই পদ্ধতিতে কখনও কখনও শিরা দিয়ে খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ বিশেষ তরল পদার্থ দেওয়ার প্রয়োজনও পড়ে।

২. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritoneal Dialysis): আগত মাসআলায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরাম হেমো-ডায়ালাইসিস সাওমের বিশুদ্ধতায় প্রভাব ফেলবে কিনা সে বিষয়ে দুই ধরণের বক্তব্য পেশ করেছেন:

প্রথম মত: অধিকাংশ আলেমের মতে, হেমো-ডায়ালাইসিস সাওম নষ্ট করে দিবে। সঊদী আরবের ‘আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিইয়া ওয়াল-ইফতা’ও এই ফাতওয়া দিয়েছে।

কেননা হেমো-ডায়ালাইসিস করতে গেলে রোগীকে বিভিন্ন ধরণের ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। যেমন, ব্লাড থিনার বা রক্ত পাতলা করার ঔষধ, হরমোন, ভিটামিন, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কার্বোহাইড্রেট। নিঃসন্দেহে এসব

পদার্থ সাওমে প্রভাব ফেলে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ডায়ালাইসিস শরীরে পরিচ্ছন্ন রক্ত সমৃদ্ধ করে। আবার কখনও রক্তের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য উপাদানও যোগান দেয়। এটিও সাওম ভঙ্গ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ডায়ালাইসিস করলে একই সাথে দু'টি সাওম ভঙ্গকারী বিষয় যুক্ত হয়।

দ্বিতীয় মত: বর্তমান যুগের কোনো কোনো আলেমের মতে, হেমো-ডায়ালাইসিস সাওম নষ্ট করবে না। কেননা হেমো-ডায়ালাইসিস ইনজেকশনের মতই; এটি খাদ্যও নয়, আবার পানীয়ও নয়, বরং এর মাধ্যমে পেনিটোরিয়াম (Peritoneum) বা পেটের অন্ত্রচ্ছদে ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং ক্ষণিক পরে তা আবার বের করে নেওয়া হয়, অথবা ডায়ালাইসিস যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত নেওয়া হয় এবং পরিশোধন করে তা আবার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritoneal Dialysis) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?[৩৫]

বিবরণ: মানব দেহের অন্যতম প্রধান কাজটি করে থাকে কিডনী। বিষ, অন্যান্য তরল পদার্থ এবং অতিরিক্ত লবণ থেকে শরীরের রক্ত পরিশোধনের কাজটি সে করে থাকে। কিডনীর ক্রিয়া অকেজো হয়ে গেলে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে কিডনী ধোয়ার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং জীবনের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। ডায়ালাইসিস-এর প্রকারের মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস অন্যতম। এক্ষণে, সাওমে এর কোনো প্রভাব আছে কি?

হুকুম: দুইভাবে কিডনী ডায়ালাইসিস করা হয়:

১. হেমো-ডায়ালাইসিস: এর আলোচনা গত হয়ে গেছে।

---

[35] মূল বইয়ের ৪৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস: এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ দুই লিটার পরিমাণ গ্লুকোজ/ডেক্সট্রোজ একটি নলের সাহায্যে নাভীর উপরের অংশে পেটের পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে (Peritoneal Cavity) প্রবেশ করানো হয় এবং ক্ষণিক পরে তা আবার বের করে নেওয়া হয়। এক দিনে কয়েক বার এ রকম করতে হয়। ফলে পেরিটোনিয়ামের মাধ্যমে রক্তে বিদ্যমান আয়ন, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কার্বোহাইড্রেট-এর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মাধ্যমে গ্লুকোজ সাওম পালনকারীর রক্তে পৌঁছে যায়।

সাওমের বিশুদ্ধতায় এর প্রভাব আছে কিনা সে বিষয়ে ঠিক আগের মাসআলার মতো দুই ধরণের মত পাওয়া যায়।

সাওম পালনকারীর জন্য সাপোজিটোরি (Suppository) কি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?[৩৬]

বিবরণ: রোগীর মধ্যে এমন কিছু উপসর্গ পাওয়া যায়, যার কারণে রোগীর পাছায় সাপোজিটোরি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এতে অর্শ রোগের ব্যথা কমে যাওয়া, শরীরের তাপমাত্রা নেমে যাওয়াসহ আরো অনেক উপকার হয়। অনুরূপভাবে মহিলাদেরকে কোনো কোনো সময় তাদের লজ্জাস্থানে সাপোজিটোরি, ডুশ (Douche), কল্পোস্কোপ (Colposcope) দিতে হয়। এক্ষণে এসব সাপোজিটোরি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কি?

হুকুম: আগেকার ফকীহগণ মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা আকারে কোনো তরল পদার্থ দেওয়ার প্রয়োজন পড়লে তা তাদের সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের দুই ধরণের মত পাওয়া যায়:

---

[36] মূল বইয়ের ৪৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথম মত: মালেকী এবং হাম্বলীদের মতে, কোনো মহিলা তার সামনের রাস্তায় কোনো তরল পদার্থ দিলে তা তার সাওম ভঙ্গ করবে না। কেননা মেয়েদের যোনির সাথে পাকস্থলীর কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া তা দেহের অন্যান্য বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই।

দ্বিতীয় মত: হানাফী এবং শাফে‘ঈদের মতে, কোনো মহিলা তার সামনের রাস্তায় কোনো তরল পদার্থ দিলে তা তার সাওম নষ্ট করবে। কেননা মেয়েদের মূত্রাশয়ের সাথে পাকস্থলীর যোগসূত্র রয়েছে। কানে কোনো তরল পদার্থ দিলে যেমন সাওম ভেঙ্গে যাবে, এক্ষেত্রেও বিধান একই।

উপরোক্ত মতানৈক্যের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, প্রথম মতানুযায়ী এসব সাপোজিটোরি সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে না। ‘আন্তর্জাতিক ফিক্বহ একাডেমী’ এই পক্ষ সমর্থন করেছে। শাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীনও এই ফাতওয়া দিয়েছেন।

তবে দ্বিতীয় মতানুযায়ী, এসব সাপোজিটোরি সাওম ভঙ্গ করবে।

সাওম পালনকারীর জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিধান[৩৭]

বিবরণ: বর্তমান যুগের মত আগে এভাবে রক্তদান কর্মসূচীর বন্দোবস্ত ছিল না। বর্তমানে ব্লাড ব্যাংক নির্মিত হয়েছে, যার প্রধান উৎসই হচ্ছে, রক্তদান। কারণ, কিছু কিছু রোগীর রক্তের জরুরি প্রয়োজন পড়ে। এক্ষণে, রক্ত দিলে তা রক্তদানকারীর সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে কি?

হুকুম: সাওম পালনকারীর জন্য শিঙ্গা লাগানোর মাসআলার ওপর স্বেচ্ছায় রক্তদানের এই মাসআলাটি ক্বিয়াস করা যায়। মাসআলা দু'টির মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। কারণ দু'টিতেই শরীর থেকে রক্ত বের করার প্রসঙ্গটি রয়েছে। অবশ্য একটির উদ্দেশ্য চিকিৎসা গ্রহণ এবং অপরটির উদ্দেশ্য অন্যকে সাহায্য। উদ্দেশ্য যাই হোক, মূল বিষয় হচ্ছে, সাওম পালনকারীর দেহ থেকে রক্ত বের হওয়া। পূর্ববর্তী ফকীহগণ সাওম পালনকারীর

---

[37] মূল বইয়ের ৪৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জন্য শিঙ্গা লাগানোর মাসআলাটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের দুই ধরণের মত পাওয়া যায়:

প্রথম মত: হাম্বলী মাযহাব, ইসহাক, ইবনল মুনযির এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ফকীহর মতে, শিঙ্গা লাগালে সাওম নষ্ট হয়ে যাবে। শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া রহ. এই মত গ্রহণ করেছেন। সঊদী আরবের 'আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিইয়া ওয়াল-ইফতা' এই পক্ষ সমর্থন করেছেন।[38]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالـمَحْجُومُ»

"যে শিঙ্গা লাগায় এবং যার লাগানো হয়, তাদের উভয়ের সাওম ভেঙ্গে যাবে"।[39]

---

[38] ফাতওয়া নং ১১৯১৭।

[39] সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৭৭৪। ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, এই বিষয়ে এটি বিশুদ্ধতম হাদীস।

দ্বিতীয় মত: অধিকাংশের মতে, শিঙ্গা লাগালে সাওম নষ্ট হবে না। কেননা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাওম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন”।[40]

তিরমিযীর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইহরাম এবং সাওম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন”।[41] তারা বলছেন, নিচের হাদীস প্রথম হাদীসটিকে মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছে। কারণ, শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, শিঙ্গা লাগাচ্ছিলেন এমন একজন

---

[40] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৯।

[41] সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৭৭৪।

ব্যক্তির পাশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর রামাযানের ১৮ তারিখে হেঁটে গেলেন এবং বললেন, أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالـمَحْجُومُ "যে শিঙ্গা লাগায় এবং যার লাগানো হয়, তাদের উভয়ের সাওম ভেঙ্গে যাবে"। অপর পক্ষে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বিদায় হজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন এবং ইহরাম ও সাওম অবস্থায় তিনি তাঁকে শিঙ্গা লাগাতে দেখেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরের ঘটনা আগের বর্ণনাকে রহিত করে দিচ্ছে।

উপরোক্ত মতানৈক্যের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, প্রথম মতানুযায়ী স্বেচ্ছায় রক্ত দিলে তা সাওম নষ্ট করবে। তবে দ্বিতীয় মতানুযায়ী, তা সাওম ভঙ্গ করবে না।

সাওম পালনকারীর রক্ত পরীক্ষা করার বিধান[৪২]

বিবরণ: রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু রোগীর রক্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, রোগী সাওম রেখেছে। এক্ষণে, রক্ত পরীক্ষা করালে কি তা তার সাওমে কোনো প্রভাব ফেলবে?

হুকুম: পরীক্ষার জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সামান্য পরিমাণ রক্ত নিলে তা শিঙ্গা লাগানোর মত বিবেচিত হবে না। কেননা কোনো কোনো হাদীসে শিঙ্গা লাগালে কেন সাওম নষ্ট হবে, তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, রোগীর দুর্বলতা বোধ। কিন্তু সামান্য রক্ত নিলে সেই দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। শাইখ মুহাম্মাদ উসাইমীন রহ. এই মতের পক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে ফাতওয়া দিয়েছেন।

সাওম নষ্ট না হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, রোগীর দেহ থেকে সংগৃহীত রক্ত অবশ্যই খুব সামান্য হতে হবে। উল্লেখ্য যে,

---

[42] মূল বইয়ের ৪৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোনো কোনো সময় এক সাথে কয়েক রকম পরীক্ষার জন্য বেশি পরিমাণ রক্ত নেওয়া হয়। আর সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে আগের মাসআলার মতভেদ এখানেও প্রযোজ্য হবে। সঊদী আরবের 'আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ লিল-বুহূছ আল-ইলমিইয়া ওয়াল-ইফতা'-এর ফাতওয়ায় এসেছে, 'সংগৃহীত রক্ত যদি সামান্য পরিমাণ হয়, তাহলে তাকে ঐ দিনের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। পক্ষান্তরে সংগৃহীত রক্ত বেশি হলে ঐ দিনের ক্বাযা আদায় করতে হবে। তাহলে একদিকে যেমন মতানৈক্যের ঊর্ধ্বে থাকা যাবে, অন্যদিকে তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করা হবে'।[43]

---

[43] ফাতওয়া নং ৫৬।

এটি মূলতঃ ফিকহের আধুনিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত বৃহৎ গবেষণা কর্মের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। শুধু সাওম বিষয়ক আধুনিক মাসআলাসমূহ এখানে আলোচিত হয়েছে। যেমন, আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চাঁদ দেখা, যেসব দেশে ২৪ ঘন্টার বেশি সময় রাত বা দিন অবশিষ্ট থাকে সেখানকার সাওমের অবস্থা, সাওম পালনকারী কর্তৃক ইনহেলার ব্যবহার, অক্সিজেন নেওয়া, নাক, কান ও চোখে ড্রপ ব্যবহার, জিহ্বার নিচে টেবলেট রাখা, এনেসথেসিয়া করা, ইনজেকশন লাগানো, ক্যাথেটার, ডায়ালাইসিস, সাপোজিটরী ইত্যাদির বিধান।